তারিখ ... 15 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

মো. আবু সালেহ সেকেন্দার

শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন কে শুনবে?

সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনে ভারতের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়েছে। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা দুই মেরুতে অবস্থান নেওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে ওই সংকটের সমাধান হবে বলে মনে হয় না। ভারতের গণমাধ্যমে ওই ছাত্র আন্দোলন নিয়ে নানা খবর, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় বেশ ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ওই বিষয়ের ওপর শুভনীল চৌধুরীর 'বিশ্ববিদ্যালয় তো প্রশ্ন করতেই শেখায়' শীর্ষক প্রবন্ধে চোখ আটকে গেল। কী অসাধারণ কথা! শিক্ষার ইতিহাসও তো এ কথার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্ন করতে শেখায়'। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী আর শিক্ষকের তর্ক-বিতর্কে কত শত নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে সেই ইতিহাস কে না জানে! অনেক সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারার কারণে দুজনের দুটি পথ দুদিকে চলে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে নতুন মত ও পথ।

ইসলামের ইতিহাসে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ওই কথার বড় প্রমাণ। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল বিন আতার গুরু ছিলেন ইমাম হাসান আল বসরী। একদিন এক ব্যক্তি হাসান বসরীকে প্রশ্ন করেন : কোনো মুসলমান গুরুতর পাপ কাজ করলে তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা উচিত কি? উত্তরে বসরী ওই অপরাধী ব্যক্তি ভণ্ড—এমন মত প্রকাশ করেন। গুরুর পাশে বসে থাকা শিষ্য ওয়াসিল বিন আতা গুরু বসরীর ওই উত্তর মেনে না নিয়ে তিনি বললেন : 'ওই ব্যক্তি মুসলমান ও অমুসলমান কোনোটিই নয়। তার অবস্থান এই দুইয়ের মাঝামাঝি স্থানে।' শুধু আতা নয়, এমন হাজার হাজার উদাহরণ দেওয়া যাবে—যেখানে ছাত্র শিক্ষকের মতের সঙ্গে শুধু দ্বিমত পোষণ নয়, ছাত্র শিক্ষকের বক্তৃতার ভুল ধরেছেন নির্দ্বিধায়। শিক্ষকও হাসিমুখে তাঁর ভুল স্বীকার করে শিক্ষার্থীর বক্তব্য মেনে নিয়েছেন। দার্শনিক ও গণিতবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'দি অটোবায়োগ্রাফি অব বার্ট্রান্ড রাসেল'-এ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন : 'ছাত্র ভুল চিহ্নিত করে উত্থাপন করলেও শিক্ষকদের কেউ ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। একবার উদস্থিতিবিদ্যার ওপর এক তরুণ শিক্ষক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতার একপর্যায়ে এক তরুণ শিক্ষার্থী শিক্ষককে বাধা দিয়ে বলেন, ঢাকনার ওপর কেন্দ্রবিমুখী বলের কথা কি আপনি ভুলে যাননি? শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জাপটে ধরেন এবং বলেন, আমি ২০ বছর ধরে এই উদাহরণটি ওইভাবে ব্যবহার করছি, কিন্তু তুমিই সঠিক।' এ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষক ৪০ বছর ধরে ভুল পড়ালেও কোনো শিক্ষার্থী যদি তা ধরিয়ে দেয়, তাহলে ওই শিক্ষক তা কি মেনে নেবেন? ছাত্রকে কি ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সাধুবাদ জানাবেন? গুরুর মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ! শিক্ষকের বক্তৃতায় ভুল ধরিয়ে দেওয়া! বাংলাদেশে ভাবা যায়! চিরুনি অভিযান দিয়েও এমন গুরু-শিষ্য সত্যি খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ আছে। আর ভুল ধরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, যদি কোনো শিষ্য সাহস করে গুরুর মতের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন তাহলে তার কপালে বহুত দুঃখ আছে। ওই গুরুর হাতে যদি পরীক্ষার নম্বর থাকে, তবে তো আর কথা নেই! কত ধানে কত চাল তা ওই শিষ্য পরীক্ষার ফল বেরোলেই টের পাবে।

যদিও এমন হওয়ার কথা ছিল না। কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে—কলেজে কাঠামোবদ্ধ পড়ালেখা হয়, সেখানে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি ও জ্ঞান বিকাশের সুযোগ থাকে সীমিত। ফলে ছাত্ররা শিক্ষকের ক্লাসের বক্তৃতা শোনে আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সনদপত্র লাভ করে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে, শ্রেণিকক্ষের বাইরে গুরু-শিষ্যের আলাপ হবে, তর্ক-বিতর্ক চলবে, কাঠামোবদ্ধ বিষয়ের বাইরেও বিশ্বের নানা বিষয় নিয়ে জ্ঞানের নানা স্তরে সময়-অসময়ে আলোচনা জমবে। শিষ্য যেমন গুরুকে প্রশ্ন করবে, তেমনি গুরুও শিষ্যকে প্রশ্ন করবেন। সক্রেটিসের ভাষায়, 'জ্ঞানের শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা, তার কাছ থেকে উত্তর জেনে দেখানো যে জ্ঞানটা তার মধ্যেই ছিল।' সক্রেটিসের এই দর্শনের চর্চা কি আদৌ আমাদের দেশের শিক্ষকদের মধ্যে আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক হিসেবে বলতে পারি সক্রেটিসের ওই দর্শনের চর্চা এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব কম পরিলক্ষিত হয়। অনেক স্বনামখ্যাত শিক্ষকও ক্লাসে ছাত্রদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন না। অনেক সময় ছাত্ররা প্রশ্ন করলে এক ধমক দিয়ে বসিয়ে দেন। আমার এক বন্ধু বলছিল, এক স্বনামখ্যাত শিক্ষকের ক্লাসে স্যারের বক্তৃতা-সংশ্লিষ্ট এক প্রশ্ন করেছিল। স্যার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা কি আনন্দ স্কুল পাইছ? বহ!' এরপর ওই স্যারের ক্লাসে আর কারো প্রশ্ন করার দুঃসাহস হয়নি। মাঝে মাঝে ভাবি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন আনন্দ স্কুল হয় না। ছাত্ররা কেন ক্লাস করে আনন্দ পায় না? শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির নম্বর দিয়ে কেন আমাদের ছাত্রদের ক্লাসে ধরে রাখতে হয়!

জ্ঞানের সৃষ্টি ও বিকাশের জন্য প্রশ্ন করার বিকল্প নেই। আর ওই প্রশ্ন করার অনুমতি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে না থেকে আনন্দ স্কুলে থাকে তাহলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, ওই আনন্দ স্কুলই চাই। নামে কিছু যায় আসে না। আনন্দ স্কুলই যদি শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে শেখায় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে আনন্দ স্কুলই আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়ায় কোনো দোষ নেই।

দুই

জ্ঞানপিপাসু মানুষদের একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় বা ইউনিভার্সিটির প্রকৃত অর্থও আমাদের সে কথা বলছে। ইউনিভার্সিটি অর্থ একদল মানুষের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো এক স্থানে জড়ো হওয়া। আরো সহজ করে বললে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান অন্বেষণকারীদের গিল্ড বা সংঘ। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অথবা গুরু-শিষ্য সবাই ওই সংঘের সদস্য। দ্বাদশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার আগেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে চর্চা হতো, সেখানে গুরু-শিষ্যের একে অপরকে প্রশ্ন করা ও একে অপরের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমেই জ্ঞানচর্চা হতো। মহান দার্শনিক সক্রেটিসের শিক্ষা দেওয়ার প্রকৃত পদ্ধতি ছিল প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে ভালো-মন্দ অথবা ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয়ে জানা ও বোঝার চেষ্টা করা। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডায়ালগস অব সক্রেটিস'-এর পাতায় পাতায় এ কথার প্রমাণ রয়েছে। সক্রেটিসের মতো কনফুসিয়াসও শিষ্যদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতেন। শিষ্যরা নির্দ্বিধায় সক্রেটিস ও কনফুসিয়াসকে প্রশ্ন করতে পারতেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এখন কি সেই সংস্কৃতি তৈরি করতে পেরেছি, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিঃশঙ্কচিত্তে শিক্ষককে প্রশ্ন করতে পারে? নিজের কাছে নিজে বারবার প্রশ্ন করি, সত্যি কি এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্ন করতে শেখায়?

শুভনীল লিখেছেন, 'জেএনএইউ শেখায় যে সত্য জটিল এবং গভীর। শেখায়, পথচলতি যুক্তিহীন কথাকে বিশ্বাস কোরো না, সত্যের সন্ধানে যুক্তিতে শাণ দাও, প্রশ্ন করতে ভয় পেয়ো না। এমনকি শিক্ষকদের প্রশ্ন করো।' শুভনীল যে মিথ্যা বলেননি সাম্প্রতিক জেএনএইউয়ের ছাত্র আন্দোলন তার বড় প্রমাণ। সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের শীর্ষ পদে থেকেও যুক্তির কাছে হার মেনে, মিথ্যার সঙ্গে আপস না করে ছাত্রনেতারা ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলনে পাশে দাঁড়িয়েছেন। শিক্ষকরা দলীয় রঙের ঊর্ধ্বে উঠে সত্য প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করছেন। বাংলাদেশে কি জেএনইউয়ের ছাত্রনেতাদের মতো ক্ষমতার লোভ ত্যাগ করে সত্যের পথের অভিযাত্রী হওয়ার মতো ছাত্রনেতা পাওয়া যাবে? শিক্ষকরা কি রঙের জাল ছিন্ন করে যুক্তি দিয়ে মুক্তির মিছিলের পতাকা ওড়াবেন? অসম্ভব কল্পনা! এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রশ্ন করতে শেখায় না বলেই আমরা খুব সহজে সব মেনে নিই। একেবারে দেয়ালে পিঠ না ঠেকা অথবা নিজের স্বার্থে আঘাত না লাগা পর্যন্ত গা বাঁচিয়ে চলি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও যেদিন প্রশ্ন করতে শিখবে, সেদিন এ দেশের অনেক সংকট দূর হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠবে গণতন্ত্রের সূতিকাগার। ছাত্ররাজনীতির নামে অছাত্রদের দৌরাত্ম্য কমবে। শিক্ষকদের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটবে। অগণতান্ত্রিক মানসিকতার শাসকদের ভিত কেঁপে উঠবে। গণতন্ত্রের মুখোশ পরা একনায়কদের পতন হবে। জেগে উঠবে বাংলাদেশ। কিন্তু বিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হচ্ছে, দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে নিঃশঙ্কচিত্তে শিক্ষার্থীরা কার কাছে প্রশ্ন করবে? শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন শোনার মতো কতজন শিক্ষক আছেন এ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে?

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
salah.sakender@gmail.com

কালের কণ্ঠ